Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৬৫তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ / 24.08.2025

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

(৬৫তম অন্তর্জাল সংখ্যা)

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
শ্রীপ্রীতিকুমারের অধ্যাত্ম সাধনা	শ্রী প্রণব ঘোষ
শ্রীশ্রীদেবী চণ্ডিকার বোধন	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী
গীতা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বাণী	শ্রী অরবিন্দ
প্যারিসের দিন রাত্রি	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য
আমি ভালো আছি	শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালবীয়া
মধ্যবিত্তের দিনলিপি	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Founded by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine, RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, thereafter converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and to be published in the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 8910977590.

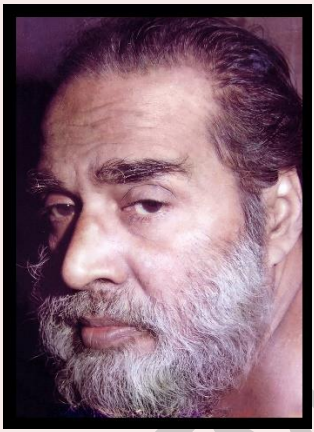

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

"জ্ঞানলাভ করলে কর্মত্যাগ করতে হবে তা নয়, নিষ্কাম অনাসক্ত কর্মের ভিতর দিয়ে সিদ্ধিলাভ করা যায়। সিদ্ধিলাভের পরও কর্ম করা চলে, করতেও হবে - কিন্তু সে কর্ম ব্যক্তিগত লাভ অলাভের চিন্তা দ্বারা হবে না, সে কর্ম হবে জগতে ভগবৎ ইচ্ছা সম্পাদন, লোক সকলকে ভগবৎ পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা।"

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

গতমাসে আমার লেখা না প্রকাশিত হওয়ায় অনেক পাঠকের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়েছে। দোষটা সবই আমার নয়। অগ্রহায়ণ সংখ্যা এত দেরী করে ছাপানো হয়েছিলো – সেটা সামাল দিতে কেউ আর আমার লেখার অপেক্ষা করেন নি। একেবারে সংখ্যাটি পৌষ মাস না পড়তেই ছাপিয়ে ফেলেছিলেন। আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো। ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে গেলো প্লটের। মাঝে অনেক ঘটনা বেড়ে গেলো।

শ্রীপ্রীতিকুমার নিজের সংসারকে যা না দিতে পেরেছিলেন, জনৈক ভক্তকে তার সবটা আশীর্বাদ দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি একদিন সেকথা উল্লেখ করতে শ্রীপ্রীতিকুমার অনেক লোকের সামনে আমাকে খুব বকেছিলেন। বলেছিলেন, "সকলে তো চাইতে শেখে না - চাইতে জানে না। চাইবার একটা নিয়ম আছে, কায়দা আছে।" সেদিন চুপ করে শুনেছিলাম, কথা বলিনি। চাইতে শিখেছি, গত ছ' বছর ধরে শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে চাইতে শিখেছি টাকা নয়, পয়সা নয়, অপমানের প্রতিকার। সবচেয়ে মজার কথা হলো, না চাইলেও তিনি আমার কষ্টের লাঘব করেন। ক'দিন আগে তাঁর জনৈক ভক্ত সুভাষদাকে বলেছিলেন, "পুণ্যি করতে এসে ফেঁসে গেলাম।" কথাটা কানে এলো। আমি একটি সন্তানের মা। যাকে আমি অনেক স্নেহে যত্নে লালন-পালন করে বড় করেছি, তার অবিমৃষ্যকারিতার ফল তো ভগবান তাকেই দেবেন। কিন্তু কেউ যদি তার উপকার করে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে এমন একটি কথা বলে ফেলেন, আমার মাতৃহৃদয়ের ব্যথা কোথায় যাবে ? কথাটা শোনবার পর থেকে ছটফট করেছি, অপমান বোধ করেছি, কিন্তু সৌজন্যবোধের জন্য কিছু বলতে পারিনি। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ ভক্তের সন্তানের জীবনে কয়েকদিন আগে বিপর্যয় নেমে এলো। ঐ ছেলে কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমার অন্ত প্রাণ। তার ভগবান ঐশী শক্তি সম্বন্ধে যা ধারণা সব শ্রীপ্রীতিকুমারে অর্পিত। তাই তার বাবার কথায় ব্যথিত হয়েও

ছেলের অকল্যাণ আমি সইতে পারিনি। শ্রীপ্রীতিকুমারের নাম করে ছেলেটিকে সুস্থ করবার প্রার্থনা করেছি, তাকে আমার সাধ্যমত সুস্থ করবার চেষ্টা করেছি।

কিছু কিছু লোক দেখেছি জীবনে যত বিপত্তিই আসুক না কেন শ্রীপ্রীতিকুমারের প্রতি সব সমর্পণ করে বসে থাকেন। তার মধ্যে একটি পরিবার শ্রীসুভাষ পালের। এ' প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম না করলে অন্যায় হবে। তিনি হলেন শ্রীমান কিশোর ব্যানার্জী। নিজের সন্তানের উপর অভিমান হলে নালিশ জানাবার দুটি জায়গা আছে আমার - কিশোর ও কেয়া। কেয়া তো সব শোনে কিন্তু ব্যাপারটা দু'দিনের বলে উড়িয়ে দেয়। আর কিশোর? মামীমার কষ্ট হলে সে কাহিল হয়ে পড়ে। কি করলে মামীমার দুঃখ কমবে সে সম্পর্কে সে সর্ব্বদা সজাগ। কি কঠিন অসুখে সে ভুগছে, কিন্তু সব কিছু সহ্য করে নিচ্ছে। "মামা" ছাড়া সে আর কোথাও সারেন্ডার করেনি। এই যন্ত্রণা আমি ভোগ করলে একবার কালীঘাটে যেতাম, একবার দক্ষিণেশ্বর যেতাম, একবার তারাপীঠ যেতাম, একবার বারাণসী যেতাম। একবার রামকৃষ্ণ আশ্রম, অন্যবার ভোলাগিরি আশ্রমে যেতাম। (আর এই যাই বলে ভগবানের মারটা আমিই ভালো করে খাই)। তবু আমি চাই আমি থাকতে থাকতে যেন কিশোর বাপী সোমা এদের কিছু না হয়। আমি চলে যাবার পর যা হয় হোক, আমি তো দেখতে আসব না!

এবার একটি ভালো খবর দিয়ে লেখা শেষ করি। বাকী ব্যাখ্যা পরে করবো। আমাদের বাড়ীতে একটি ছোট্ট সদস্যা বেড়েছে। সবাই আমাকে 'জুনকো'র সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখতে বলেছিলো। আমি তার নাম রেখেছি "বাচেন্দ্রী"। ঠাকুরমশাই ষষ্ঠী পুজো করে নাম বলতে গিয়ে দুবার তোতলালেন। তবু আমি নিজ অভিমতে অনড়। নাম আর বদলাচ্ছি না।

সবচেয়ে মজা হোল দীর্ঘদিন ধরে যে ধারণাটা মনে মনে লালন করছিলাম আর মুখে বলছিলাম, "বাবা! মেয়ে আর চাই না। আবার কষ্ট পাব। ছেলেই ভালো।" O.T. থেকে মুখ বাড়িয়ে অনিমা যখন বলে উঠলো বাপীকে, "তোমার কন্যা হয়েছে"

– আমি তো ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। হঠাৎ দেখি কিশোর হাসপাতালের তিনতলার সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। বললাম, "সাথে করে মেয়ে নিয়ে এলে?" অনিমা বললো, "তোর কষ্ট দেখে দাদা মেয়ে পাঠিয়েছেন।" বাপীকে বললাম, "যাক বাবা! আর পরের মেয়ের পিছনে ছুটতে হবে না।" বাড়ী এসে হাসি পেলো। যাকে পরের মেয়ে বলছিলাম, সে তো বাপীরই মেয়ে। সেই তো আমার চোখের মণি ছিলো। তাকে কাছে পাচ্ছিনা বলেই পরের মেয়ে বললাম।

বাচেন্দ্রী বাড়ী এসেছেন। আমি যথারীতি তার পরিচর্য্যা করছি। আমার সবচেয়ে অবাক লাগে সেই মুখটা আর এই মুখটা কোথায় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দু'টি মুখ কি করে এক হয়ে যায় আমার মাথায় আসেনা। ঈশ্বরের কাছে সেই মায়ের সুমতি প্রার্থনা করি যে মা তার পিতার অর্থের গর্বে নিজের সন্তানদের পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। সেই শিশুদুটি কোনও দিনও জানতে পারবে না আমাদের এই ছোট্ট বাড়ীটায় তাদের জন্য কত আদর কত সম্মান অপেক্ষা করছিল। যে যার জীবনে পথ খুঁজে নেয়, কারও জন্য কেউ আটকে থাকে না। কিন্তু আমরা যারা প্রাচীনপন্থী তারা 'গেল গেল' বলে মাথা কুটে মরি। এখনও অপেক্ষা করে আছি আমাদের বাড়ীটা কবে আবার ভরে উঠবে।

- - - - - - - -

(** রচনাকাল – জানুয়ারি, ১৯৯৩)

"নিয়মিতভাবে যে মন্ত্র জপ করবে তার পরে সেটা ভিতর থেকে আপনা হতে আবৃত্তি হতে থাকবে, তার মানে আভ্যন্তরীণ সত্তাতে সে মন্ত্র চলে গেছে। এর ফল অনেক ভাল হয়।"

-শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীপ্রীতিকুমারের অধ্যাত্ম সাধনা

প্রণব ঘোষ

আমার দাদা প্রীতিকুমার গুপ্তযোগী ছিলেন; নিজেকে সচরাচর প্রকাশ করতেন না। তাই তাঁর সাধনা বা উপলব্ধির কথা অল্পই জানা যায়। সাধনার শেষে যখন তিনি বেশ কিছুকাল লোকাচার্যের মতো ছিলেন তখন কিছু লোক তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাঁর অলৌকিক যোগ বিভূতির পরিচয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সাধক জীবন চিরকাল রহস্যাবৃত থেকে গেছে। আমি দাদার জীবনের একটি পর্বে তাঁর কাছে ছিলাম। কখন কখনও তাঁর মুখ থেকে দু'এক কথা শুনেছি, কখনও বা তাঁকে সাধনারত অবস্থায় দেখেছি। যা দেখেছি যা শুনেছি তাই এখানে প্রকাশ করছি।

দাদার সাধন ভজনের সূত্রপাত কৈশোরে। তখনও তিনি স্কুলের ছাত্র। এখানে বলে রাখা দরকার, দাদার বয়স যখন ১০/১১ বছর তখন বাবার মৃত্যু হয়। মৃত্যু হলেও তিনি প্রয়োজনে দাদাকে দেখা দিতেন এবং পরিচালিত করতেন। সাধনপথের নির্দেশও তিনি দিতেন।

একবার স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ আমাদের স্কুলে এসেছিলেন। দাদা তখন স্কুলের ছাত্র। বাবা দাদাকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন - তুমি স্বামিজীর কাছে যাবে; উনি তোমাকে দেখবেন। দাদা কাছে যেতেই প্রণবানন্দজী দাদাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং আশীর্বাদ করেন। মা একবার আমাদের নিয়ে বেশ কিছুদিন মামাবাড়ি ছিলেন। দাদা তখন একাই বাড়িতে থাকতেন। মনে হয় তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় সক্রিয় কর্মীরা সব আত্মগোপন করে আছেন। বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী আমাদের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদা একা থাকেন দেখে তাঁদের মধ্যে তিন চার

জন আমাদের বাড়িতে থাকতেন। এঁদের মধ্যে দুজনের নাম আমার জানা - একজনের নাম সন্তোষ কুমার ঘোষ। তিনি সম্ভবত খুলনা জিলা কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন। দেশ ভাগের পর দমদম ঘুঘুডাঙ্গা অঞ্চলে বাস করতেন। অপরজন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির বিখ্যাত তাত্ত্বিক নেতা এবং পরবর্তী কালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় নিহত সরোজ দত্ত। বাবা দাদাকে দেখা দিয়ে হরিনাম করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কম্যুনিস্ট নেতারা রাত্রে যখন ঘুমাতেন, দাদা রাত জেগে হরিনাম করতেন। একদিন তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে সন্তোষদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি রে, তুই সাধু হবি নাকি?" শেষ পর্যন্ত সন্তোষদার কথাই খেটে গেল। দাদা সাধুই হলেন। সাধু শ্রীপ্রীতিকুমারকে দেখতে পরে সন্তোষদা বার কয়েক অক্ষয় বোস লেনের বাসায় এসেছিলেন। আমি তখন ঐ বাসায় দাদার সঙ্গেই থাকতাম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে দাদা বোম্বাই যান এবং একজন আত্মীয়ের বাসায় থাকেন। সেখানেই তাঁর ধ্যান যোগ সূচনা। বলাবাহুল্য এই পথে বাবাই তাঁকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। এই সময় দাদা একটি অচিন্ত্যনীয় দর্শন লাভ করেন। একদিন বাবা দেখা দিয়ে কিছু চাল ও কলা নিয়ে শহরের একপ্রান্তে একটি বিশেষ স্থানে উপস্থিত হতে বলেন। সেই নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হতেই দাদা দেখেন স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট সশরীরে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দাদা চাল কলা তাঁকে দিলেন এবং তিনি হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এই অলৌকিক ঘটনায় দাদা খুবই অভিভূত হন। এর কি অর্থ বা তাৎপর্য তা জানবার জন্য তাঁর খুব আগ্রহ হয়। তখন তিনি পন্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের নলিনীকান্ত গুপ্তের কাছে চিঠি লেখেন। উত্তরে নলিনীকান্ত নাকি দাদাকে লেখেন - তোমার উপর ভূতে ভর

করেছে। ঐ চিঠি পেয়ে দাদা খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ঐদিনই যীশুখ্রীষ্ট পুনরায় দাদাকে দর্শন দেন এবং দাদা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেন ঐ যীশুমূর্তি ধীরে ধীরে বাবার মূর্তিতে পরিণত হয়।

ছবিতে যীশুখ্রীষ্টকে যেমন দেখা যায় সেই চেহারার সঙ্গে দাদার অপেক্ষাকৃত কম বয়সের চেহারার অপূর্ব মিল ছিল। একবার মধুপুরে গেলে এক ভদ্রলোক সেই সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাঁকে যীশুখ্রীষ্টের একখানা সুন্দর প্রতিকৃতি উপহার দেন। সে প্রতিকৃতিখানা সম্ভবত এখনও শ্যামবাজার অক্ষয় বোস লেনের বাসায় আছে।

বোম্বাইয়ে দাদা কতদিন ছিলেন মনে নেই, হয়ত বছর দেড়েক হবে। তারপর আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় এসে দাদা নিয়মিত ধ্যান যোগ অভ্যাস করতেন। এই সময় একদিন বাবা দেখা দিয়ে যোগ সাধনার নিয়ম প্রণালী শিক্ষার জন্যে শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্র কুমার ঘোষের কাছে যেতে বলেন। সেই নির্দেশ অনুসারে দাদা শ্রদ্ধেয় বারীন ঘোষের কাছে যেতেই তিনি দাদা যেন তাঁর কত পরিচিত এইভাবে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং পরপর তিনদিন যোগ শিক্ষা দেন।

এর কিছুকাল পরে আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একদিন দাদা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভবানীপুরের একটি রেস্তোঁরায় বসে চা খাচ্ছিলেন। এই সময় একজন অপরিচিত লোক এসে তাঁকে বাইরে ডেকে নিয়ে যান এবং বিন্ধ্যাচলে যাবার নির্দেশ দেন। অন্য আর একজন এসে কোথায় কিভাবে যেতে হবে সবকিছু জানিয়ে একখানা টিকিটও দিয়ে যান। এক্ষেত্রে বাবা কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেন নি। তথাপি দাদা অলৌকিক ভাবে প্রাপ্ত ঐ নির্দেশ মেনে বিন্ধ্যাচলে যেতে দ্বিধা করেন নি। বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হতেই জনৈক ব্যক্তি তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে মাইলখানেক

ভিতরে নিয়ে যান। একমাস একটানা সাধন শিক্ষা লাভের পর দাদা পুনরায় নির্দেশ পেয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিন্ধ্যাচল শুধু বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর জন্যেই বিখ্যাত নয়। এই অঞ্চল তন্ত্রসাধনা এবং প্রাচীন নাথ সম্প্রদায়ের সাধন ক্ষেত্র হিসাবেও প্রসিদ্ধ। বিন্ধ্যাচলে যাবার অব্যবহিত আগে বা পরে আর একটি ঘটনা ঘটে। তার সঙ্গে দাদার সাধনার কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানিনা, তবে অলৌকিক ঘটনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। দাদা তখন শিকদার বাগান ষ্ট্রীটে অমৃতবাজার পত্রিকার Sunday Magazine-এর সম্পাদক রমেশচন্দ্র রায়ের বাসায় থাকেন। রমেশবাবু গঙ্গায় পিতৃপুরুষের তর্পণ করবেন, সেই সঙ্গে দাদাও নিজের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করবেন বলে স্থির হয়। তখন বাবা দেখা দিয়ে বলেন, পিণ্ডদান একবার হয়েছে, দ্বিতীয়বারের প্রয়োজন নেই, বরং একটা কাজ কর, গঙ্গার ঘাটে বটগাছের নীচে তেরজন লোক তোমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্য একখানা গামছা, চার আনা পয়সা ও কিছু বিড়ি কিনে নিয়ে যেও। দাদা জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে তাঁদের চিনবো? বাবা বলেন, তোমার চিনতে হবেনা, তাঁরাই তোমাকে চিনে নেবেন। দাদা এই নির্দেশের কথা রমেশবাবুর কাছে প্রকাশ করে ফেলেন। রমেশবাবু কতটুকু বিশ্বাস করেছিলেন জানিনা, তবে গঙ্গার ঘাটে তিনি দাদার সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা গঙ্গার ঘাটে পৌঁছালে দেখা গেল তের জন সৌম্যকান্তি পুরুষ বটগাছের নীচে অপেক্ষা করছেন। দাদা কাছে যেতেই তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। দাদা তাঁদের গামছা ও পয়সা দিলে একজন জিজ্ঞাসা করলেন "বিড়ি আনতে কি ভুলে গেছেন?" দাদা বিড়ি এনেছিলেন, কিন্তু অলৌকিক ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে বিড়ি বার করতে ভুলে যান। থলে থেকে বিড়ি বার করে দিলে তাঁরা সবাই সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা গামছারও

প্রশংসা করেন, তারপর বলেন "আমরা তৃপ্ত"। তখন দাদা ও রমেশবাবু তাঁদের প্রণাম করবার জন্য নত হতেই তাঁরা অদৃশ্য হয়ে যান।

এর পরের ঘটনাও কম বিস্ময়কর নয়। শিকদার বাগানে রমেশবাবুর বাসায় থাকতে থাকতেই একদিন এক ভদ্রলোক এসে দাদাকে বলেন তাঁকে কিছুদিনের জন্যে পুরী যেতে হবে। বলা বাহুল্য সাধন ভজনের প্রয়োজনেই এই নির্দেশ। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ও সিকদার বাগান স্ট্রীটের সংযোগস্থলে ডাঃ ইউ এন ব্রহ্মচারীর বাড়ির সামনে একজন লোক এসে পুরীর একখানা টিকিটও দিয়ে যান। পুরী ষ্টেশনে নামতেই একজন ভদ্রমহিলা স্বামীর সঙ্গে এসে দাদাকে অভ্যর্থনা করে বলেন, "আমি স্বপ্নে পেয়েছি আপনি পুরীতে আসছেন, আমি যেন আপনার সেবা করি।" থাকার ব্যবস্থা হয় ধর্মশালায়। ধর্মশালায় সাধারণত তিনদিন থাকতে দেওয়া হয়। দাদার ক্ষেত্রে সে নিয়ম প্রযোজ্য হয়নি। যতদিন প্রয়োজন ছিল দাদা ঐ ধর্মশালায় ছিলেন এবং ঐ ভদ্রমহিলা তাঁর সেবা করেছিলেন। পুরীতে দাদা যে কয়দিন ছিলেন একটি কুকুরও সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। পুরী ছেড়ে আসার সময় কুকুরটিও ষ্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। আমি শুনেছি, কখনও কখনও মহাত্মারা কুকুরের ছদ্মবেশে এসে পাহারা দিয়ে থাকেন। দাদার ক্ষেত্রেও তেমন কিছু একটা হতে পারে।

কলকাতায় ফিরে এসে দাদা নির্দেশ পেয়েছিলেন রাতের দিকে দক্ষিণেশ্বর যেতে। একদিন গভীর রাতে ঠাকুরের ঘর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাদা অনুভব করেছিলেন যেন ঠাকুর আরও জনা কয়েকের সঙ্গে তাঁর ঘরে রয়েছেন এবং কথাবার্তা বলছেন। পঞ্চবটী ও বেলতলায় যাবার জন্যেও নির্দেশ পেয়েছিলেন। একদিন বেলতলায় যাবার পথে কোন অদৃশ্য শক্তি তাঁকে বাধা দেয়।

৫এ অক্ষয় বোস লেনে দাদা সম্ভবত ১৯৪৮ সাল থেকে থাকতে শুরু

করেন। এখানেই ঠাকুরের আসন স্থাপন করে দাদা নিয়মিত ধ্যান ও পূজাপাঠ শুরু করেন। আসনে ছিলেন মা কালী, শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা। পরে শ্রীঅরবিন্দের পাদপদ্মও স্থাপিত হয়েছিল। আমি তখন দাদার সঙ্গেই থাকতাম। সকালে শয্যা ত্যাগের পর স্নান সেরে দাদা নিয়মিত ধ্যান ও পূজাপাঠ করতেন। তখন সম্ভবত গীতাও পড়তেন, তবে চণ্ডীপাঠের কথাই আমার বেশি মনে পড়ে। দাদার চণ্ডীপাঠ শুনে শুনে আমার অনেক জায়গা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এরমধ্যে আবার হরিনাম চলত। তবে দাদা নিজে সংকীর্তন করতেন না। দুজন লোক ঠিক করা ছিল। তারা রোজ সকালে এসে খোল বাজিয়ে নামকীর্তন করে যেতেন। বিশেষ বিশেষ দিনে ৫/৬ জন হরিসংকীর্তন করতেন। একবার আমার কোন পরীক্ষার আগের দিনে দাদা এমনি এক হরি সংকীর্তনের ব্যবস্থা করেন। অনেকক্ষণ ধরে সংকীর্তন চলে। পড়তে পারছি না বলে মনে খুব ক্ষোভ। ভাবছিলাম আমার পরীক্ষার কথা জেনেও দাদা এই কীর্তনের ব্যবস্থা করলেন! তখন তো আর বুঝিনি দাদার তখন দিব্য আবেশ চলছে। গভীর রাতে আসনে বসে দাদা ব্যাকুল কণ্ঠে 'মা মা' করতেন। দাদার সেই প্রাণ নিঙড়ানো 'মা মা' ডাক আমি যেন এখনও শুনতে পাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ডাকার মতো একবার মাকে ডাকো তো দেখি, মা কেমন না শুনে থাকেন। দাদার সেই ডাকার মতো ডাকে মা যে সাড়া দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রতি দাদার গভীর ভক্তি ছিল। দাদার সাধনার ধারা অনেকটা ঠাকুরের ধারার মতোই। ঠাকুর যেমন হিন্দু ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন মত অনুসরণ করে সাধনা করেছিলেন, দাদাও তেমনি যোগ, তন্ত্র, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং শেষে ঠাকুরের 'যত মত তত পথ'-এই আদর্শ অনুসরণ করে লোক শিক্ষা প্রচার করেন।

শ্রীঅরবিন্দের যোগমার্গে শিক্ষা গ্রহণ করে বাবার নির্দেশে দাদা শ্রীঅরবিন্দের গীতা অনুধ্যান ও প্রচার করেন।

সাধক অবস্থায় দাদা যে সকল মহাপুরুষের সঙ্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রামঠাকুরের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রামঠাকুরের সঙ্গে দাদার সাক্ষাৎ হয় কলকাতার ডিক্সন লেনে। দাদাকে দেখে তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। খুব ভালো, খুব ভালো, অনেক হবে - বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। রামঠাকুরের প্রতি দাদার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমি একবার গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দাদাকে জিজ্ঞাসা করি। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানোর উপমা দিয়ে দাদা বলেছিলেন গুরুর সংস্পর্শে ঐভাবে আলো জ্বলে যায়। দাদা আরও বলেছিলেন, সব সময় মন্ত্র দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। স্পর্শে, সান্নিধ্যে, দৃষ্টিতেও দীক্ষা হয়ে যায়। কেন জানি না, তারপর বলেছিলেন, আমি তো রামঠাকুরের মতো মহাপুরুষের সঙ্গ করেছি।

তারাপীঠের সঙ্গেও দাদার সাধনার গূঢ় যোগ ছিল। বেশ কিছুদিন আমি তাঁকে 'তারাপীঠ ভৈরব' বইখানা পড়তে দেখেছি। তিনি বহুবার তারাপীঠ গেছেন এবং সেখানে একটা স্থায়ী আশ্রয় নির্মাণের জন্য জমিও কিনেছিলেন।

নীরব সাধনায় দাদার দিব্য সত্তার কোরকটি কবে যে প্রস্ফুটিত হয়ে গেছে, তা আমরা বুঝিনি। ফুল ফুটলে যেমন চারদিকে তার সৌরভ ছড়ায়, দাদার সাধনার সৌরভও দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শুরু হয়ে যায় ভক্ত সমাগম। অনেক সাধু সন্ত মহাপুরুষও দাদাকে স্বীকৃতি জানান। কাশীর একজন পাঞ্জাবী সাধু দাদাকে দেখে কয়েক হাত ছিটকে যান, তারপর বলেন, "আপনি তো দেখছি জন্ম যোগী। দেখতে পারছেন না, কত মহাত্মা আপনাকে পাহারা দিচ্ছেন?

বালীর একজন তান্ত্রিক সাধুও প্রায় একই কথা বলে দাদাকে প্রণাম করেছিলেন। আর বাহের বাবাও দাদাকে মহাপুরুষ বলে অভিবাদন করেছিলেন।

দাদা মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নেই, তবে তিনি কত বড় মহাপুরুষ ছিলেন তা পরিমাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তিনি সাধনা ও সিদ্ধির যে স্তরে উপনীত হয়েছিলেন তা যে কোন সাধারণ গৃহীর পক্ষেই অসাধ্য।

শ্রীশ্রীদেবী চণ্ডিকার বোধন **স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী**

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।। চণ্ডী ১১/৫৫
এইভাবে দানবের উপদ্রব হবে যে যে কালে।
তাদের নাশিব আমি অবতরি সেই সেই কালে।।

মা ভগবতীর এই অঙ্গীকার জগজ্জীবের পক্ষে অশেষ সুখ স্বস্তি ও মঙ্গলের হেতু। এই অভয় আশ্বাসের উদাহরণ মার্কণ্ডেয় মুনি বর্ণনা করেছেন। তখনো হয়নি সৃষ্টি এই পৃথিবীর। শুধু জল আর জল। জল থৈ থৈ মহার্ণব। কোথাও কেহই নাই - ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা। তারই মাঝে বটপত্রে শায়িত বিষ্ণু যোগনিদ্রামগ্ন। তাঁর নাভি পদ্মে বসে সৃষ্টি চিন্তামগ্ন ব্রহ্মা।

এমন সময় বিষ্ণুর কর্ণমল হতে জাত হল মধু ও কৈটভ দুই অসুর। সেই মহাজলধি মধ্যে তারা বাড়তে লাগলো। মনে মনে ভাবলো এ আবার কি? এত জল এলো কোথা থেকে? আমরাই বা হলাম কোথা থেকে? অনেক কাল এইভাবে ভাবতে ভাবতে – তাদের মনে হলো এ বুঝি কোন মায়াশক্তির খেলা। এইরূপ চিন্তা করতে

করতে একদিন শুনলো দৈববাণী – পেলো দুর্লভ মনোজ্ঞ মন্ত্র বাগ্‌বীজ। অনন্য মানসে সেই মন্ত্র জপ ধ্যান স্মরণ মনন করতে করতে একদিন তারা জ্যোতির্ময়ী মহাশক্তির দর্শন পেলো। দেবীর থেকে লাভ করলো ইচ্ছামৃত্যু বর। এই বর পেয়ে তারা হল স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বিনীত। মহাপ্রতাপে সেই মহার্ণবে জলজন্তুদের সাথে বিচরণ করতে করতে তারা দেখলো ব্রহ্মাকে। তৃতীয় পুরুষকে দেখে তারা হল ঈর্ষান্বিত। তাঁকে সে স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে আদেশ করলো।

ব্রহ্মা ভীত হয়ে বিষ্ণুকে জাগাবার জন্যে বিষ্ণুর স্তব শুরু করলেন। কিন্তু তিনি জাগ্রত হলেন না। তখন তিনি বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ ব্যাপিনী যোগনিদ্রা দেবীর স্তব করতে লাগলেন। দেবী সন্তুষ্টা হয়ে বিষ্ণুকে ত্যাগ করায় বিষ্ণু জাগ্রত হয়ে দেখলেন সেই অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত। বিষ্ণু তাদের প্রতিহত করতে গিয়ে তাদের সাথে পাঁচ হাজার বছর ধরে লড়ে চললেন তথাপি তাদের নিহত করতে পারলেন না। দৈবের নির্বন্ধ মধুকৈটভ তখন বললো - "তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা খুব খুশি হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। বিষ্ণু বললেন - তাহলে তোমরা আমার বধ্য হও। অসুরদ্বয় বললো, তথাস্তু, তবে কিনা যেখানে জল নাই সেইখানে আমাদের বধ কর। তারা ভেবেছিল জল বিনা তো আর কোথাও কিছু নাই সুতরাং কেমন করে বধ করবে? কিন্তু বিষ্ণু তাদের জঙ্ঘাদেশে রেখে নিহত করলেন। এই মধু কৈটভের মেদ মাংসে সৃষ্টি হলো এই পৃথিবী। এই হেতু ইহার অন্য নাম মেদিনী। এই যোগনিদ্রা রূপিনী মহাশক্তি হলেন মহাকালী। ইনি তামসী শক্তি মহাভয়ঙ্করী ভীমামূর্তি। তাঁর দশ বাহু, দশ পাদ, দশ মুখ ও সুবিশাল ত্রিশটি নয়ন। হাতে খড়্গ, বাণ, শূল, শঙ্খ, চক্র, ভূশুণ্ডী পরিঘ এবং রক্তাক্ত নরমুণ্ড বিধৃত। অপর দিকে ইনিই অভয় এবং রূপ, সৌভাগ্য, কান্তি ও শ্রী-র প্রতিষ্ঠা।

ইহার পর হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেল। পৃথিবী হয়ে উঠলো শস্য শ্যামলা, স্বর্গে দেবতা, মর্তে মানুষ, পাতালে অসুর। রম্ভাসুরের পত্নী মহিষীর গর্ভে জন্মালো মহিষাসুর। কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে লাভ করলো অমরত্ব। অমরত্ব লাভ

করে স্বর্গ মর্ত পাতালে আধিপত্য বিস্তার করলো। দেবগণ পরাজিত হয়ে স্বর্গহারা হলেন। তাঁরা ব্রহ্মার কাছে অভিযোগ করলেন। ব্রহ্মা নিরুপায় হয়ে দেবতাদের সাথে নিয়ে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হলেন। দেবতাদের সব কথা শুনে তাঁদের মধ্যে হলো মহাক্রোধ উৎপন্ন, মুখমণ্ডল আরক্তিম। মুখমণ্ডল হতে মহাতেজ উত্থিত হলো। সেই সঙ্গে দেবগণের দেহ হতেও তেজ উৎপন্ন হয়ে আকাশ ব্যাপ্ত হল। সেই তেজ একত্রিত হয়ে জাত হল এক মহীয়সী নারীমূর্তি। দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্র দ্বারা তাঁকে সুসজ্জিত করলেন। সেই দেবী দেবগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী মহিষাসুরকে নির্জ্জিত করলেন।

মহিষাসুর ছিল মহাভক্ত ও জ্ঞানী। মহিষাসুরের ভক্তিতে দেবী বাৎসল্য - রসে সিক্তা হলেন এবং শ্রীচরণে স্থান দিলেন। যার জন্যে সেই অসুর দেবী পূজার সঙ্গে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হয়।

এই দেবী রাজসী মহালক্ষ্মী। এঁর সহস্র বাহু হলেও সিংহ বাহিনী -অষ্টাদশ ভূজারূপে পূজিতা হন। এই দেবীকে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি অর্চ্চনা করেছিলেন রাজা হৃতরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন ও সমাধি ব্রহ্মজ্ঞান পেয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অকাল বোধন করে রাবণকে নিধন করেছিলেন। ইনি অক্ষমালা বিভূষিতা। কমণ্ডলু, শঙ্খ, পদ্ম ও নানা অস্ত্র বিধৃতা। ইনিই কান্তিরূপা, সৌভাগ্যশালিনী সর্ব দেবদেবী রূপে প্রতিষ্ঠিতা।

ইহার পর যুগ যুগ অতিক্রান্ত হল। এক সময় শুম্ভ নিশুম্ভ দুই অসুর ভ্রাতা তপস্যা করে দেবতার বর প্রাপ্ত হয়ে প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে। তারা ত্রিলোক জয় করলো। দেবতারা হল স্বর্গ হতে বিতাড়িত। তখন দেবগণ দেবীর প্রদত্ত অঙ্গীকার স্মরণ করে হিমালয়ে এসে দেবীর আরাধনা করতে লাগলেন। হিমালয় তো পর্বত আর পর্বত দ্বারা সজ্জিত। তারই মাঝ দিয়ে পথ করে জাহ্নবী নদী আপন মহিমাকে বিস্তার করে বয়ে চলেছেন সমুদ্র পানে। দেবদারু চন্দনাদি সুউচ্চ বৃক্ষরাজি দ্বারা নিবিড় অরণ্য গড়ে উঠেছে। নানা ফুলে ফলে পরিপূর্ণ। সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে চলেছেন দেবী গঙ্গাস্নানে সখিগণ সহ। আলুলায়িত কেশদাম বাতাসে হচ্ছে

আন্দোলিত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সখীরা বঙ্কিম নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখে। কাঠবিড়ালীরা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসে, চুপি চুপি দেখে, আবার দৌড়ে পালায়। বনফুল ঝরে পড়ে রক্তিম চরণে। পাখীরা ডাকে, ময়ূর নাচে। হরিণেরা গাছের ফাঁক দিয়ে তৃণ খাওয়া ভুলে চেয়ে রয়। শাখামৃগেরা গাছের ফল তুলে ফেলে। জলে সোনারুই মুখ তুলে চায় আবার ডুবে যায়। দেবীর চোখের দৃষ্টি দিগন্ত ছোঁয়া, রূপের ছটা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। শুনতে পেলেন দেবগণের দেবী স্তুতি বন্দনা-

নব দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তা প্রণতাঃ স্মতাম্।। চণ্ডী ৫/৯

তিনি দেবতাদের জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কার স্তব করছো? দেবীরই দেহকোষ হতে এক শিবামূর্তি আবির্ভূত হয়ে বললেন দেবগণ আমারই স্তব করছেন। এই মূর্তির নাম 'কৌশিকী', অতি সৌন্দর্যময়ী এই দেবী।

শুম্ভ নিশুম্ভের চর- চণ্ড-মুণ্ড সেখানে উপস্থিত ছিল। দেবীর অসামান্য রূপ দেখে শুম্ভ নিশুম্ভকে সংবাদ দিল, "পতিরূপে আমাদের দুজনের যে কোন একজনকে বরণ করতে পারো।" দেবী এই কথা শুনে বললেন -

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
যো মে প্রতিবল লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি।। চণ্ডী ৫/১২
সমকক্ষ বলে মোর দর্পচূর্ণ করবে যে জন।
সমরে জিনবে মোরে মম পতি হবে সেই জন।।

দূত মুখে এই বার্তা পেয়ে ধূম্রলোচনকে পাঠালো দেবীকে ধরে আনার জন্য। কিন্তু সে হল দেবী হস্তে নিহত এবং নিহত হল অনেক সৈন্য। তখন প্রধান সেনাপতি রক্তবীজকে পাঠালো বহু সৈন্য সহ। সেও হল নিহত। নিশুম্ভকে পাঠালো যুদ্ধ করতে। দেবীর হাতে সেও হল নিহত। শেষে শুম্ভ সসৈন্য উপস্থিত হল। ভীষণ যুদ্ধ হল। শুম্ভ দেখলো দেবী একা নহেন। দেবীর অনুরূপ বহুমূর্তি তার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। শুম্ভ বললো তুমিতো অন্যের সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করছো। তোমার মিথ্যা গর্ব। দেবী বললেন-

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ।। চণ্ডী ১০/৫
এই দেখ আমি বিনা এ জগতে কেহ আর নাই।
এরা তো বিভূতি মোর প্রবেশিছে আমাতে সবাই।।

এরপর উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হল এবং দেবী হস্তে শুম্ভ নিহত হল। অসুরেরা পাতালে প্রবেশ করলো।

দেবগণ মহোল্লাসে দেবীর স্তুতি করতে লাগলেন-

দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোহখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরাস্য।। চণ্ডী ১১/৩
হও গো প্রসন্না মা জগজ্জননি
দুর্গতি হারিণি আশ্রিতের।
বিশ্বের নিয়ন্ত্রী মাগো রক্ষা করো
তুষ্টা হও ঈশ্বরী বিশ্বের।।

এইভাবে দেবগণ দেবীর স্তবস্তুতি করে দেবীর কৃপা লাভ করে পুনরায় স্বর্গ প্রাপ্ত হলেন।

ইনি সাত্ত্বিকী মূর্তি, দেবী সরস্বতী। ইনি অষ্টভূজা। হাতে বাণ, মুষল, শূল, চক্র, ঘণ্টা, হল ও ধনু। ভক্তাশ্রিত জনের অভীষ্ট দায়িনী। তিনি বিশ্বসন্তানের প্রতি আশীর্বাণীতে বললেন-

সর্ববাধা বিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎ প্রসাদেন ভবুষ্যতি ন সংশয়ঃ।। চণ্ডী ১২/১৩
সর্ববাধা মুক্ত হয়ে ধনধান্য পুত্রাদি সবাই।
আমার প্রসাদে পাবে নিঃসন্দেহে মনুষ্য মাত্রেই।।

ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

গীতা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের বাণী **শ্রী অরবিন্দ**

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তক। গীতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই চরম ও গুহ্যতম, গীতায় যে ধর্মনীতি প্রচারিত, সকল ধর্মনীতি সেই নীতির অন্তর্নিহিত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, গীতায় যে কর্মপন্থা প্রদর্শিত, সেই কর্মপন্থা উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ।

গীতা অযুত রত্নপ্রসূ অতল সমুদ্র। সমস্ত জীবনকাল সেই সমুদ্রের নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে করিতেও গভীরতার অনুমান করা যায় না, তল পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্তি। ভগবান কি, জগৎ কি, সংসার কি, ধর্মপথ কি, গীতায় এই সকল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। অথচ সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কর্মশিক্ষাই গীতার উদ্দেশ্য। ইহাতেই গীতার সার্বজনীন উপযোগিতা।

গীতা কর্মযোগকে ভগবান লাভের প্রতিষ্ঠা বিহিত করে। শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ কর্মেতেই জ্ঞান জন্মায় অতএব গীতোক্ত মার্গের পথিক পথত্যাগ করিয়া দূরস্থ শান্তিময় আশ্রমে পর্বতে বা নির্জন স্থানে ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করেন না, মধ্যপথেই কর্মের কোলাহলের মধ্যেই হঠাৎ সেই স্বর্গীয় দীপ্তি জগৎ আলোকিত করে, সেই মধুর তেজোময়ী বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

সাধারণ যোগী সংসারকে ভয় করেন, পলায়নপূর্বক যোগাশ্রমে স্মরণ লইয়া যোগে প্রবৃত্ত হন। সংসারই কর্মযোগীর যোগাশ্রম।

মানুষ যদি অনাসক্তভাবে কর্ম করেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম ভগবানকে লাভ করিবেন।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সৌজন্যে

প্যারিসের দিন রাত্রি **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য্য**

ছেলেবেলায়, খুব সম্ভব ১৯৬৭ সালে 'অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস' দেখে বুঝেছিলাম মঁপাসার শহর কতটা মোহময়ী! প্যারিসিয়ান জাজবার, জাজক্লাব অথবা ম্যুলারুজ ক্যাবারের কথা না হয় বাদ দিলাম, সন্ধ্যা সাতটা থেকে ন'টার আলো আঁধারিতে সেইন নদীর ক্রুজ থেকে প্রথমে সানসেট তারপর আলেকজান্ডার ব্রিজ, নোতারদাম গির্জা, ল্যুভর সমেত আরো অনেক আলোকিত সৌধ এবং সর্বোপরি আলোর স্তম্ভের মত আইফেল টাওয়ারে আলোর ঝিকিমিকি দেখার রোমাঞ্চই আলাদা। এর সাথে যদি প্যারিসের একমাত্র আকাশচুম্বী ভবন ৬৮৯ ফুট উচ্চতার 'MONT PARNASSE' র মাথায় উঠতে পারেন, তবে আলো ঝলমল প্যারিসের মাঝখানে আলোর সিঁড়ির মত আইফেল টাওয়ার আপনাকে কোন স্বপ্নের দেশে নিয়ে ফেলবে তা শুধু আপনিই জানবেন। এ হেন প্যারিসের দরজা খোলার সুযোগ ছেলেবেলায় না থাকলেও, ভারত দর্শন মোটামুটি ভাবে শেষ হয়ে গেলে ইউরোপ যেন দুয়ারে কড়া নাড়ছিল। স্বপ্নটা অবশ্য উস্কে দিয়েছিল 'স্মাইলস পার মাইলস' ইউরোপ ডেলাইটসের ভ্রমণ সূচী হাতে ধরিয়ে দিয়ে। গতবছর এদের সাথে আফ্রিকার জঙ্গলে ট্যুরটা ছিল মোটের উপর সন্তোষজনক, তাই ১৩ দিনের ইউরোপ ট্যুরে ২৪ জনের দলটার সাথে ভিড়তে দ্বিধা করিনি। শুরু করেছিলাম লন্ডন থেকে। তারপর লন্ডন থেকে প্যারিস – সেও যেন এক স্বপ্নের যাত্রা। হিথরোর অট্রিয়াম হোটেলের পার্কিং এ ঝকঝকে এক লং ডিস্ট্যান্স লাক্সারি বাস ২৫শে মে'র সকালে হাজির হতেই ঘড়ির কাঁটাকে এক ঘন্টা এগিয়ে নেওয়ার পালা – বাকি ইউরোপের সময় যে লন্ডন থেকে একঘন্টা এগিয়ে। ৫২ সিটের বাসে যাত্রী আমরা ২৪ জন, তার ওপর মাখনের মত রাস্তা। তাই হিথরো থেকে ডোভারের ১৬৪ কিলোমিটার যে কোথা থেকে উড়ে গেল তা বোঝা গেল না। ডোভার পোর্ট থেকে বাস সমেত ফেরিতে ক্যালে (Calais) – সেটাও কম রোমাঞ্চকর নয়। আমরা বিশাল ফেরির আট আর নয় তলার কাঁচে ঘেরা প্যাসেঞ্জার এরিয়ায় ইচ্ছে মত চেয়ার টেবিলে

জায়গা নিয়ে নিলেও বড় বড় বাস এবং ছোট প্রাইভেট গাড়িরা স্থান পেল যথাক্রমে জাহাজের পাঁচ এবং সাত তলার পার্কিং-এ। চেয়ারের পাশেই নীচে যে সুনীল সাগরের বিস্তার, আসলে তা আটলান্টিক আর উত্তর সাগরের সংযোজক ইংলিশ চ্যানেল। আমরা অবশ্য দু'ঘন্টার কিছু কম সময়ে প্রায় ২৭ নটিক্যাল মাইল বা ৫০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ইংলিশ চ্যানেলের যে বর্ধিতাংশ পার হয়েছি তার নাম ডোভার প্রণালী। নামে কি আসে যায়? ইংলিশ চ্যানেলের নামেই যে উচ্ছ্বাসের ফানুস আকাশে উড়তে চায়! ক্যালে থেকে আবার সেই বাস। এবার দূরত্ব নয় নয় করে প্রায় ২৯৩ কিলোমিটার। আগেই বলেছি আরামদায়ক বাস, সুন্দর রাস্তা, আর ততোধিক সুন্দর দৃশ্যের কল্যাণে দূরত্ব যেন দৌড়ে পালায়। অবশেষে পৌঁছে যাই 'Novotel Marne la Vallee Noisy le Grand'-এর আমাদের নির্দিষ্ট ১১২ নম্বর ঘরে। আগামী দু'রাতের জন্য ওটাই যে আমাদের দু'জনের ঠিকানা।

প্যারিসে এলে লোকে আর কিছু দেখুক না দেখুক যে দু'টো জিনিষ দেখবেই তা হল ল্যুভর মিউজিয়ম আর আইফেল টাওয়ার। টাওয়ার দেখতে কোনো চেষ্টা করতে হয় না, সেইন রিভার ক্রুজ থেকে তো বটেই, দেখা যায় প্যারিসের অনেক জায়গা থেকেই। তবে মাথায় চড়তে গেলে খরচা আছে। আসবো সে কথায়। প্রথমে বলি ল্যুভর মিউজিয়ামের কথা। আটটি কিউরেটরিয়াল বিভাগ সম্বলিত আট লক্ষ বর্গফুটের এই মিউজিয়াম ভালোভাবে দেখতে এক মাস সময়কেও কম মনে হতে পারে, কারণ প্রগৈতিহাসিক কাল থেকে ২১ শতক পর্যন্ত যে নানান শিল্পবস্তু এখানে প্রদর্শিত হয়েছে তার সংখ্যা ৩৮,০০০ এর কম হবে না। 'মোনালিসা', 'ভেনাস ডি মিলো', আর 'উইংগ্ড ভিক্টরি' অবশ্যই এখানকার সেরা আকর্ষণ, কিন্তু চাইনিজ চ্যাং-এর মতো কোন গাইড সঙ্গে না নিলে মিনিমাম সময়ে ম্যাক্সিমাম আকর্ষণীয় শিল্প-সম্ভার দেখা অসম্ভব। এই ল্যুভর কিন্তু ১২ থেকে ১৩ শতকের মধ্যে দুর্গ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল ফরাসী রাজ দ্বিতীয় ফিলিপ দ্বারা। পরে ১৫৪৬ সালে প্রথম ফ্রান্সিস ঐ প্রাসাদকে ফরাসী রাজাদের মূল বাসভবনে রূপান্তরিত করেন। ১৬৮২-তে ষোড়শ লুই তাঁর বাসভবন ভার্সাই প্রাসাদে স্থানান্তরিত করলে এটি ব্যবহৃত হতে

থাকে রাজকীয় সংগ্রহশালা ও প্রদর্শনী কেন্দ্র হিসেবে। তারপর ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের পর জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম নিয়ে ১৭৯৩ সালে ল্যুভর পরিচিতি পায় বিশ্বের বৃহত্তম আর্ট মিউজিয়াম হিসেবে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, দিনের বেলায় যাদুঘরের ভিতর দেখেই আপনার অবাক হওয়া ফুরিয়ে ফেলবেন না। রাতের আলোয় অন্ততঃ একবার গ্লাস আর মেটালের তৈরি পিরামিড সমেত আলো ঝলমল ল্যুভরকে একবার প্রত্যক্ষ করুন – সে যেন এক রূপকথার রাজ্য।

এবার আসি প্যারিসের আইকন ১০৮৩ ফুট উচ্চতার পেটাই লোহার তৈরি আইফেল টাওয়ারের কথায়। ফরাসী বিপ্লবের শতবর্ষকে স্মরণীয় করতে গুস্তাভ আইফেলের নামানুসারে এই টাওয়ার ১৮৮৭ থেকে ১৮৮৯ সালের মার্চে নির্মিত হওয়ার পর পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত হয় ১৮৮৯ সালের ১৫ই মে থেকে। ভূ-পৃষ্ঠকে বাদ দিলে টাওয়ারের তিনটি লেভেল পর্যবেক্ষকদের জন্য উন্মুক্ত। প্রথম লেভেল পর্যন্ত ৩০০ ধাপ এবং দ্বিতীয় পর্যন্ত আরও ৩০০, সিঁড়ি বেয়ে অথবা আটটি লিফটের কোনও একটি চেপে উঠে আসা গেলেও তৃতীয় লেভেলে পৌঁছাতে লিফট-ই দস্তুর। তৃতীয় লেভেলের ৯০৬ ফুট উপর থেকে পাখির চোখে প্যারিসের ভিউটা যে কি অপূর্ব – তা বলে বোঝানো যাবে না। একদিকে সেইন নদীর বয়ে যাওয়া, আর অন্যদিকে যেন জমাট বাঁধা শহর প্যারিস। সত্যিই লা-জবাব। পটের পরিবর্তন হয় 'সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢলি'। আলোর উচ্ছ্বাসে প্যারিস শহরের সে যেন অন্য আরেক রূপ। প্যারিসকে চিনতে হয় সেই দুই রূপেই।

প্যারিসে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর সম্ভবতঃ ক্রুজে সেইন রিভার, তা সে দিনে অথবা রাতে যখনই হোক না কেন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি জল-বিহারের পথেই সূর্যটা ডুবে যায় আর ফেরার বেলায় আইফেল টাওয়ার হয়ে ওঠে এক আলোকিত স্বর্গের সিঁড়ি। আইফের টাওয়ার থেকে হাঁটা পথেই পৌঁছে যাওয়া যায় ক্রুজের পয়েন্টে যেখান থেকে ছাড়ছে বিভিন্ন কোম্পানীর বিভিন্ন মানের ক্রুজ। প্যারিসে

সেইন নদীর উপর মোট ৩৭টি ব্রিজের ১৮টির তলা দিয়ে যাতায়াতের পথে বিখ্যাত সৌধরা একে একে দেখা দেয় তা-তো প্রথমেই বলেছি, এছাড়া নদীর বাম তীরে তরুণ-তরুণীদের লাগাম ছাড়া প্রেম-ও কম আকর্ষণীয় নয়। ভুললে চলবে না প্যারিসের খ্যাতি কিন্তু প্রেমের শহর হিসেবেও। ক্রুজ থেকেই দৃষ্টি কেড়েছিলো 'Conciergerie'- যা ছিল অতীতের কোর্ট হাউস সমেত প্যারিসের কারাগার। ফরাসী বিপ্লবের সময় রাণী মারী অ্যান্তোনয়েত সমেত এখানে ছিল ২৭৮১ জন বন্দী। তারও আগে ১২৮৪ থেকে ১৩১৪ সালে কোঁসিয়ের্জেরি ছিল রাজা চতুর্থ ফিলিপের বাসভবন। ভবনের নীচতলার বেশীরভাগ অংশ জুড়ে মেন-অ্যাট-আর্মস নামের হলে ছিল পাহারাদারদের থাকার জায়গা। বর্তমানে ভবনের ক্ষুদ্র একটি অংশ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা কোঁসিয়ের্জেরি দেখেছি ভেসে চলার পথেই। আর দেখেছি 'Pont Alexandre III', যা সোজা কথায় আলেকজাণ্ডার ব্রিজ। ১৮৯৬ থেকে ১৯০০ সালে তৈরি হওয়া ৫২০ ফুট দীর্ঘ আর ১২০ ফুট প্রস্থের ব্রিজকে ধরে রেখেছে ২০ ফুটের সুদৃশ্য ইস্পাতের খিলান। সেইন নদীর বুকে এত সব ব্রিজ থাকতেও দুই দিকে দুই স্তম্ভ আর অসাধারণ অলঙ্করনের কারণে আলেকজাণ্ডার ব্রিজ অনন্য।

সেইন নদীর ক্রুজ যেখানে এক ত্রিকোণ আইল্যান্ডকে অতিক্রম করে ফিরে চলার পথ ধরে, সেই আইল্যান্ডেই রয়েছে মধ্যযুগীয় ক্যাথোলিক ক্যাথিড্রাল 'Notre Dame' বা নোতার দাম গীর্জা। ১১৬৩ সালে তৈরি হওয়া ৪২০ ফুট লম্বা, ১৫৭ ফুট চওড়া আর ১১৫ ফুট উচ্চতার এই গীর্জাকে মানুষ প্রায় ভুলতেই বসেছিল । ১৮৩১ সালে নতুন করে তাকে বিখ্যাত করে তোলে ভিক্টর হুগোর 'হাঞ্চব্যাক অফ নোতারদাম'। ২২৬ ফুট উচ্চতার দুটি বেল টাওয়ার (Bell Tower) এবং দশটি মূল ঘন্টা (Main bell) বিশিষ্ট চার্চ আগুনের কবলে পড়ে ২০১৯-এ। তারপর বন্ধ ছিল পরিমার্জনের প্রয়োজনে। আমরা ভাগ্যবান যে নোতার-দাম আবার খুলে গেছে ০৭.১২.২০২৪ থেকে। আলেকজাণ্ডার ব্রিজ যে দু'টি স্থানকে সংযুক্ত করেছে তার একটি আইফেল টাওয়ার যার কথা আগেই বলেছি। অন্যটি হল 'Champs Elysees'

বা শঁজেলিজে। মাত্র ১.৯ কিলোমিটার লম্বা আর ৭০ মিটার চওড়া এই অ্যাভেনিউ প্যারিস-ট্যুরিস্ট তো বটেই, বহির্বিশ্বেও পরিচিত এখানকার উচ্চমানের দোকান, কাফে, থিয়েটার আর হিস্টোরিকাল মনুমেন্টের জন্য। শঁজেলিজের পুর্বপ্রান্তে প্যারিসের বৃহত্তম স্কোয়ার প্লেস দে লা কনকর্ডে (Place de la Concorde) আর পশ্চিমে আর্ক দ্য ত্রিয়োম্ফ (Arc de triomphe)। এই আর্ক দ্য ত্রিয়োম্ফ সহজেই ভারতীয়দের চোখ টানে তার আকৃতির কারণে – অনেকটা দিল্লীর ইন্ডিয়া গেটের মতো। ১২ রাস্তার মিলন কেন্দ্রে ফ্রান্সের এই বিজয় খিলান তথা স্মৃতি স্তম্ভ পুরানো ও নতুন প্যারিসের সংযোগ স্থলও বটে। ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়ানের যুদ্ধের সম্মানে ১৮০৬ সালের ১৫ই আগস্ট যেদিনটা আবার সম্রাটের জন্মদিন, স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন হলেও তা শেষ হয় নেপোলিয়ানের মৃত্যুরও ১৫ বছর পরে ১৮৩৬ সালে – রাজা লুই ফিলিপের রাজত্বকালে। ফ্রান্সের যাবতীয় যুদ্ধজয় আর তার জেনারেলদের নাম লেখা আছে এই ৫১×৪৫ মিটার সৌধের ভিতরে আর বাইরে। প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি, সৌধের উপর থেকে প্যারিসের প্যানোরামিক ভিউ দেখার খরচ সাধারণ ভাবে ১৬ ইউরো হলেও নভেম্বর থেকে মার্চের প্রথম রবিবার সকলের জন্য বিলকুল ফ্রি।

শঁজেলিজের পূর্বপ্রান্তে যে ‘প্লেস দে লা কনকর্ডের’ কথা বলেছি তা আসলে ১৯ একর জমির উপর ১১৭৮ ফুট দীর্ঘ আর ৬৯৬ ফুট প্রস্থের এক বিশাল স্কোয়ার। ১৭৫৭ থেকে ১৭৭২ সালে নির্মিত হওয়া এই স্কোয়ারে এলে প্রথমেই যাঁর কথা মনে আসে , তিনি ফ্রান্সের শেষ রাণী, ষোড়শ লুইয়ের পত্নী মারী অ্যান্তোনয়েত (Marie Antoinette), যিনি বিখ্যাত তার একটি কথার জন্য ‘Let them eat cake’! ফরাসী বিপ্লবের সময় (১৭৮৯-১৭৯৯) এই স্কোয়ার কুখ্যাত হয়ে ওঠে নির্বিচারে গিলোটিনে মুণ্ডচ্ছেদের কারণে। ফরাসী বিপ্লবের সময় প্যারিসে গিলোটিনে মোট যে ২৪৯৮ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়, তার মধ্যে রাজা ষোড়শ লুই, রাণী মারী অ্যান্তোনয়েত , শার্লট কর্ডে, সমেত ১১১৯ জনকে হত্যা করা হয়েছিল স্কোয়ারেই। গিলোটিনের তাণ্ডব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে বিপ্লবের অন্যতম নেতা

Robespierre কে পর্যন্ত ছাড়া হয়নি। ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল যখন রসায়ন বিদ্যার জনক আঁতোয়ান ল্যাভেয়সিয়েরের মাথা এই স্কোয়ারে ছিন্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর তাণ্ডবে তখন স্কোয়ারের নাম 'প্লেস দে লা রেভেলিউশন' হয়ে গেলেও পরবর্তীকালে পুনর্মিলনের সাক্ষী হিসাবে ১৭৯৫ থেকে আবার তার পুরোনো নাম চালু হয়ে যায়।

দিনে অথবা রাতের প্যারিস দেখতে গিয়ে আমরা যেমন ক্রুজে চেপেছি, তেমনি ভরসা করেছি দু' পায়ের উপরেও। আবার এমন অনেক জায়গা আছে, ট্যুর প্ল্যান অনুযায়ী যাদের দেখতে হয়েছে চলতি বাসের ভিতর থেকেই। তেমনি তিনটে জায়গা হল – 'মুজে দর্সে' (Musee d'Orsay), পার্লে গার্নিয়ে (Place de l'Opera) এবং প্লাস ভাদম (Place Vendome)। মুজে দর্সে মূলতঃ এক যাদুঘর। ল্যুভরের মত বিখ্যাত না হলেও যেখানে সেজান, রেঁনোয়া, ভ্যান গগের মতো মহান শিল্পীদের চিত্রকর্ম রয়েছে, তার অন্দরে প্রবেশের সুযোগ না পেলে আক্ষেপ তো থাকবেই। পার্লে গার্নিয়ে প্যারিসের অন্যতম গীতিনাট্যশালা। ১৯৭৯ আসন সম্বলিত এই ১১,০০০ বর্গমিটারের ভবনকে যদিও বাইরে থেকে দেখেছি, তবু মুগ্ধ হয়েছি এর অসাধারণ স্থাপত্য কলা প্রত্যক্ষ করে। আর Place Vendome? বাসের মধ্যে থেকে হলেও বিশাল এই পাব্লিক স্কোয়ার আমাদের নিরাশ করেনি। স্কোয়ারের মাঝখানে নেপোলিয়ানের 'অস্টারলিটজ স্মরণে যে বিজয়স্তম্ভ, সম্রাটের মূর্তিসমেত সেই স্তম্ভ দিব্য ক্যামেরায় এসে যায়! প্যারিস কমিউন বা ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশনারি গভর্নমেন্ট এই মূর্তিকে ১৮৭১ সালের ১৬ই মে ভেঙ্গে দিলেও পরে যে তা পুনঃস্থাপিত হয়েছে সেটা তো দেখাই যাচ্ছে।

দু' দিনের ছোটাছুটিতে প্যারিসের কিছুই দেখিনি বলবো না। তবে সে শুধু এক নজরে। তার গভীরে পৌঁছাতে হলে থাকতে হবে অন্ততঃ সাতটা দিন। কোনও দলের সাথে নয়, একা একা ঘুরতে হবে শহরের ২০ ভাগে বিভক্ত বিভাগের (Arrondissement) অলিতে গলিতে । মনটাকে পিছিয়ে নিতে হবে আরলি

আধুনিক যুগ আর মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যন্ত এবং অবশ্যই হাঁটতে হবে সেইন নদীর পাড় ধরে, যেখানে পথের উপর বসে থাকা অনামা শিল্পীরা অনায়াস দক্ষতায় এঁকে দেবে আপনার পোর্ট্রেট। সাধারণ মানুষের সাথে একটু মিশুন। প্যারিসের খোলা মনের মানুষ আপনার হৃদয় স্পর্শ করবেই।

যাবার আগে জেনে নিন –

১। সারা ইউরোপের মতো প্যারিসেও সাধারণ টয়লেট ব্যবহার করার খরচ মাথাপিছু ১ ইউরো (৯৯ টাকা)।

২। ইউরোপের হোটেলে ট্যাপ ওয়াটারও পানের যোগ্য।

৩। স্ট্রিট হকারদের এড়িয়ে চলুন। অবৈধভাবে নকল জিনিস বিক্রি করে বলে পুলিশ এলেই এরা পালিয়ে যায়।

৪। পাসপোর্ট / ব্যাগ সাবধানে রাখবেন। ইউরোপে পাসপোর্ট চুরি একটা সাধারণ ঘটনা।

কোঁসিয়ার্জেরি

পাবলিক স্কোয়ার

আইফেল টাওয়ারের শীর্ষ থেকে

নোতর দাম গীর্জা

আর্ক দ্য ত্রিয়োম্ফ

আলেকজান্ডার ব্রিজ

মুজে দর্সে

মোনালিসা

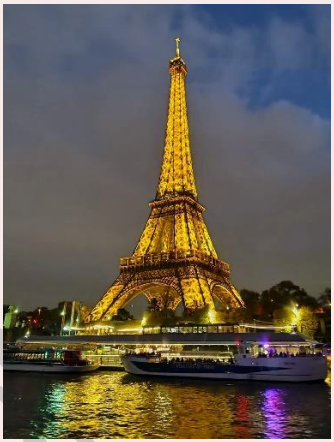

রাতের আইফেল টাওয়ার

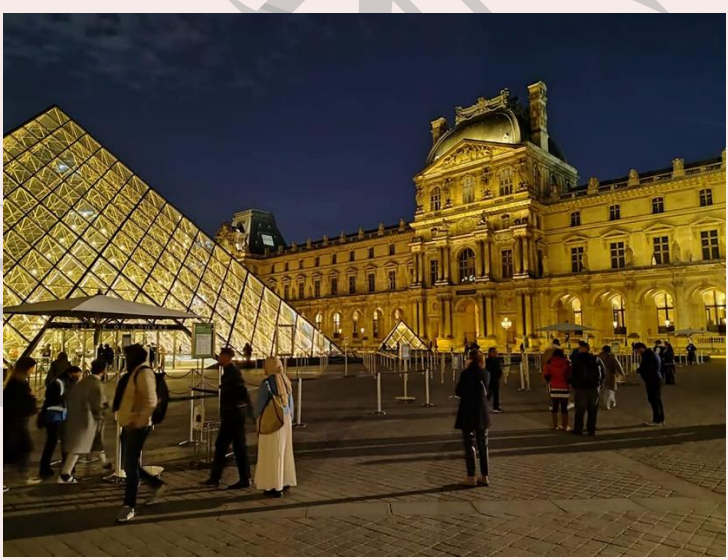

রাতের ল্যুভর

*** চিত্র-গ্রহণঃ লেখক

আমি ভালো আছি

শ্রীমতী বাণীপ্রভা মালব্য

নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দেয় পরিবারে
কেউ তো একটু বুঝবে,
তাকে কেউ তো বলবে তুমি আমাদের!
কিন্তু না, কেউ আমাকে চেনে না,
শুধু বলে, "তুমি দাও, এটা দাও, ওটা দাও,
দিয়ে যাও ....."
তাহলে কি আমি রাস্তার ধারে বসে আছি?
যেতে আসতে যেন পথের দেখা,
কেউ পাশে বসে একটু হালচাল নেয়,
জানতে চায় এভাবে আমি কেমন আছি।
হৃদয়ের বেদনা নিংড়ে হাসির নাটক
খেলে বলি – "আমি ভালো আছি। "

মধ্যবিত্তের দিনলিপি

সুনন্দন ঘোষ

একটা একটা করে ইঁট গেঁথে তৈরি হয়েছিল ফ্ল্যাটগুলো,
রোদে বৃষ্টিতে, জোয়ান বয়সের নজরদারিতে।
সাজানো হয়েছিল সোফা, ওয়ার্ডরোব, কিচেন ক্যাবিনেট।
ঘরগুলো ভরে উঠেছিল আলোয় গানে কলতানে।

আর্ধেক শতক ধরে ডাকিনী পিশাচেরা ছড়িয়ে গেল বিষের বাষ্প ।
যাদের ফুসফুস ছিল তাজা, তারা অন্য আকাশ খুঁজে নিলো।
যাদের শক্তি কম, মায়া বেশি, তারা থেকে গেল
ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীতের বেহালাবাদক হয়ে।

বৃদ্ধ এখন সিঁড়ির রেলিং ধরে নামে বৃদ্ধার ওষুধ কিনতে।
কাজের মেয়ে সব্জি কিনে দিয়ে যায়,
তার সাথে দুধ, মুড়ি, পাঁউরুটি,
চুলের বার্গাণ্ডি রঙও নিয়ে আসে মাঝে মাঝে।
সন্তান-স্নেহ আদায়ের অধিকার তার নেই,
একটু অবুঝ মায়া কুড়িয়ে নিয়ে যায় প্রতিদিন।

বুড়ো বুড়ি জানলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখে।
বুড়োর নোলা!
বুড়ি খিচুড়ি ইলিশ মাছ ভাজার তোড়জোড় করে।
দু'জনে লুকিয়ে ঘড়ির কাঁটা দেখে
আর নীরবে অপেক্ষা করে
কখন আসবে একটা ফোন
নয়ডা, ব্যাঙ্গালোর বা বেলফাস্ট থেকে।